# সত্যের উৎস

সাইয়্যেদ কুতুব

---

বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।' (সূরা আনআম, ৬ : ১৬১)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের উৎস ঐশ্বরিক। এটি এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, অন্য সব বৈশিষ্ট্য এর সাথে জড়িত। ইসলামি আকীদা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নাযিল করেছেন। বাস্তবতা, মানব অস্তিত্ব, স্রষ্টার প্রকৃতির মতো প্রশ্নগুলো নিয়ে বহু শতাব্দী জুড়ে গড়ে ওঠা দার্শনিক ধ্যানধারণা থেকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অবস্থান একেবারেই আলাদা। মানুষের আবেগ, কল্পনা এবং কুসংস্কার থেকে জন্ম নেওয়া পৌত্তলিক বিশ্বাসগুলোর সাথেও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মিল পাওয়া যাবে না।

সব আকীদার মধ্যে কেবল ইসলামই তার বিশুদ্ধ রূপ ধরে রাখতে পেরেছে। যেভাবে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন, এই দ্বীন আজও টিকে আছে ঠিক সেভাবেই। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগে অনেক নবি ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) -এসেছেন। মহান আল্লাহর প্রেরিত শিক্ষা তাঁরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন অবিকৃতভাবে। কিন্তু সময়ের পালাক্রমে বিকৃত হয়েছে সেগুলো। এ নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। নবি-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) বিশুদ্ধ শিক্ষার মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন হয়েছে। তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা, যুক্ত করা হয়েছে মানবীয় উৎস থেকে আসা নানা ত্রুটিপূর্ণ বিষয়। এত বিকৃতির মিশেলে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর বিশুদ্ধ রূপ হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম ব্যতিক্রম। ইসলাম টিকে আছে অবিকৃতভাবে। এর মূল গ্রন্থ অবিকল একই আছে। কোনো কলুষতা একে স্পর্শ করতে পারেনি, এখানে ঘটেনি সত্যের সাথে মিথ্যের কোনো সংমিশ্রণ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং পরিপূর্ণ—

নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯)

এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এবং এটি ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

দর্শন আর বিশ্বাসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো—দার্শনিক ধ্যানধারণার উৎপত্তি মানুষের চিন্তায়। অস্তিত্ব আর অস্তিত্বের সাথে মানুষের সম্পর্ককে ব্যাখ্যার জন্য মানুষ বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা হাজির করে। এসব ব্যাখ্যা শীতল আর তাত্ত্বিকতার জগতেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে আকীদার উৎপত্তি মানুষের বিবেকে। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে তা মিশে যায় মানুষের আবেগ-অনুভূতি এবং প্রায়োগিক জীবনের সাথে। বিশ্বাস হলো অস্তিত্ব, মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে একটি জীবন্ত সম্পর্ক।

তবে বিশ্বাস বা আকীদার মধ্যেও ইসলাম স্বতন্ত্র। পৌত্তলিক বিশ্বাস বা দর্শনের মতো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ কোনো মানুষের আবিষ্কার নয়। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর শিক্ষার মতো ইসলামের শিক্ষা বিকৃতও হয়নি। মানবজাতি একে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে পূর্ণাঙ্গরূপে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ব্যাপারে মানুষের করণীয় হলো—কৃতজ্ঞতার সাথে একে গ্রহণ করা, অনুধাবন করা, নিজেকে এর সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং এর শিক্ষা প্রয়োগ করা জীবনের সব ক্ষেত্রে।

ইসলামি আকীদার উৎস কুরআন। কুরআন বলে, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার ও রাহমাহ। মহান আল্লাহর প্রেরিত সব রাসূলের প্রচারিত মূল শিক্ষা ছিল এক। সবাই একই উৎস থেকে বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ পেয়েছিলেন। এই ওয়ার্ল্ডভিউ তৈরিতে তাঁদের কোনো ভূমিকা ছিল না। রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল এই ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে চালিত করা, অধ্যবসায়ের সাথে একে প্রচার করা এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া অবিকৃতভাবে। এর মধ্যে মানবীয় কোনো

ধ্যানধারণা না মেশানো; যেগুলোকে কুরআনে আহওয়া বা খেয়ালখুশি বলা হয়েছে। রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল কেবল পৌঁছে দেওয়া, মানুষ এই বার্তা গ্রহণ করল কি না, সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মানুষের মন মুক্ত হলো কি না, তা নিশ্চিত করা তাঁদের দায়িত্ব ছিল না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহকে ওহিযোগে প্রেরণ করেছি। আপনি তো জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী! কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ ওহিযোগে প্রেরিত কুরআনকে) করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে, হিদায়াত দান করি; আর আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশনা করেন, সেই আল্লাহর পথ; যিনি আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখুন, সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে যাবে। (সূরা শূরা, ৪২ : ৫২-৫৩)

> শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়! তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন, আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, তা তো ওহি যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। (সূরা নাজম, ৫৩ : ১-৪)

> নবি যদি আমার নামে কোনো মিথ্যা রচনা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে তাকে পাকড়াও করতাম, তারপর অবশ্যই কেটে দিতাম তার হৃৎপিন্ডের শিরা, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা করার থাকত না। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৪৪-৪৭)

> হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন। যদি না করেন, তাহলে আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলেন না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬৭)

> আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে, সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন (সূরা কাসাস, ২৮:৫৬)

> আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখাতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সংকীর্ণ-সংকুচিত করে দেন, (তার জন্য ইসলাম মান্য করা এমনই কঠিন) যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ শাস্তি দেন তাদেরকে, যারা ঈমান আনে না। (সূরা আনআম, ৬ : ১২৫)

ত্রুটি, অজ্ঞতা ও খেয়ালখুশি মানবীয় চিন্তা ও ধ্যানধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দুর্বলতাগুলো মানুষের গড়ে তোলা সব ধারণা, মতবাদ, দর্শন এবং পুরাণে থাকে। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর শিক্ষার মধ্যে যেসব বিষয় মানুষ নিজে থেকে যোগ করেছে, তার মধ্যেও এগুলোর প্রভাব দেখতে পাবেন। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এমন এক উৎস থেকে এসেছে, যা পরিপূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য। ঐশ্বরিক উৎস থেকে আসার কারণে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অনন্যন্যান্য, অমূল্য। এই ওয়ার্ল্ডভিউ মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মানবজীবনের সবগুলো অক্ষের জন্য প্রাসঙ্গিক। এটি পূরণ করে ব্যক্তি ও সমাজের সব চাহিদা। সর্বোপরি এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং দৃঢ় জীবনব্যবস্থা।

ভূমিকাতে আমরা বলেছিলাম, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ গ্রহণ করার একটি সঠিক পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটি নিম্নরূপ :

অন্য কোনো দর্শন, ধ্যানধারণা, প্রথাপ্রচলন কিংবা সংস্কারের কাঠামোর ভেতরে ইসলামকে গ্রহণ করা যাবে না কিংবা এগুলোর মাপকাঠিতে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বিচার করা যাবে না। চিন্তার সব কাঠামো এবং মাপকাঠি নিতে হবে ইসলাম থেকে। যা কিছু ইসলামের সাথে মেলে না, বাদ দিতে হবে তার সবকিছু। সবকিছু বিচার হবে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মাপকাঠিতে। প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন অথবা পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। ব্যক্তির চিন্তা, ধ্যানধারণা এবং অনুভূতিগুলোকেও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে, সেগুলো কতটুকু ভুল আর কতটা শুদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট... (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের উৎপত্তি কোনো মানুষের চিন্তায় হয়নি। কিন্তু তার মানে এই না যে, এটি বোধবুদ্ধির অগম্য। ইসলাম মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে নাকচ করে না। বরং ইসলামে মানবীয় বুদ্ধি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সীমানার ভেতর বুদ্ধিমত্তার কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। মানবীয় বুদ্ধিমত্তার দায়িত্ব হলো—ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও এর বৈশিষ্ট্যগুলোকে বোঝা, মূল শিক্ষাকে অবিকৃত রেখে, বাহ্যিক কোনো উৎস থেকে কিছু গ্রহণ করা ছাড়াই এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আলোকে মূল্যবোধ এবং নীতি ঠিক করা। উদ্দেশ্যহীন, দিকভ্রান্ত সাধনা থেকে মুক্ত করে বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত ও দক্ষ করে তোলা। ইসলামি জ্ঞানের ধারা যেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা রাখার সক্ষমতা আছে, সেখানে গঠনমূলকভাবে বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে।[1]

তবে ইসলামি -ওয়ার্ল্ডভিউ গ্রহণ এবং আত্মস্থ করার দায়িত্ব শুধু বুদ্ধিমত্তা বা আক্বলের না। এখানে ভূমিকা আছে মানবপ্রকৃতির অন্যান্য দিকগুলোরও। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষ সম্পূর্ণ প্রকৃতিকে সামগ্রিক পূর্ণতা হিসেবে দেখে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কিছু কিছু দিক আছে, যেগুলোর বেলায় কী, কেন, কীভাবে—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মানবীয় বোধবুদ্ধির নাগালের বাইরে। তবে অন্য ধর্ম ও দর্শনের 'রহস্য'গুলো মানবীয় বুদ্ধিমত্তার সাথে যেমন সাংঘর্ষিক, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এই দিকগুলো তেমনটা নয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সামগ্রিকভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার সাথে সাংঘর্ষিক কোনোকিছুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না। তবে মানবীয় বুদ্ধিমত্তারও সীমানা আছে। অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা ও সত্যের সামনে মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কখন, কার সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এটিও তাকে জানতে হয়। মহান আল্লাহর সত্তা ও তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্য, মহান আল্লাহর ইচ্ছা, সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক—এ বিষয়গুলো হলো এমন কিছু সোজাসাপ্টা কিন্তু অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা। এগুলো মানবীয় চিন্তা, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার নাগালের বাইরে। পরম, চূড়ান্ত এবং অসীমের আলোচনা এগুলো, কিন্তু মানুষ তো সীমিত জীব। স্থান ও কাল দ্বারা সে আবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার দেওয়াল ভেঙে বাস্তবতার অসীম ও প্রকৃত রূপ দেখতে মানুষ অক্ষম।

> হে জিন ও মানব সম্প্রদায়!, আসমানসমূহ ও জমিনের সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পারো ,অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না (আল্লাহর দেওয়া) প্রমাণপত্র ছাড়া। (সূরা রাহমান, ৫৫ : ৩৩)
>
> দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, তিনিই সকল দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। (সূরা আনআম, ৬ : ১০৩)

এই সীমাবদ্ধতা শুধু মানুষের চিন্তা কিংবা তার দৃষ্টির নয়, বরং সামগ্রিক। স্থান, কাল এবং সসীমের সীমানা মানুষ পার হতে পারে না। তাই তার দায়িত্ব হলো আলিমুল গায়িব আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্যগুলো কৃতজ্ঞতাভরে গ্রহণ করা এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা সাধ্যমতো।

মানুষ সৃষ্ট জীব, আর সৃষ্টি মাত্রই সীমাবদ্ধ। মানুষ মরণশীল, সে সর্বজনীন নয়, পরম নয়। মানুষ অনাদি নয়, শাশ্বতও নয়। তার কিছু সক্ষমতা আছে, আছে সীমাবদ্ধতাও। এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করতে পারে না সে। তার উপলব্ধিও তার অস্তিত্বের মতো সীমিত। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে। মানুষের দায়িত্ব হলো—পৃথিবীতে মহান আল্লাহর খলীফা হওয়া এবং ~~পৃথিবীতে~~ এক আল্লাহর ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করা। এই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় উপলব্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও সক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। এর বেশি নয়, কমও নয়। এমন অনেক বিষয় আছে, যা এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। সেগুলোর প্রকৃতি, ধরন আর বাস্তবতা পুরোপুরি বোঝার সক্ষমতা দেওয়া হয়নি মানুষকে। তবে তাকে সেগুলোর সম্ভাবনা অনুধাবনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সে জানে—,–মহান আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সার্বভৌম, তিনি ছাড়া আর সবকিছু সৃষ্ট, সীমিত। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যার জ্ঞান চূড়ান্ত, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ। আর তাই চিরন্তন, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়।

কুরআনে বাস্তবতার এমন বেশ কিছু দিকের কথা এসেছে, যেগুলো বোঝার সক্ষমতা মানবজাতিকে দেওয়া হয়নি। একজন আন্তরিক

বিশ্বাসী কীভাবে এ বিষয়গুলো গ্রহণ করে; আর অসুস্থ মনের মানুষ এসব বিষয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়; তা-ও কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। মানবীয় বোধবুদ্ধির অগম্য বিষয়ের মধ্যে আছে; মহান আল্লাহর যাত। মানুষ মহান আল্লাহর যাতকে বুঝতে অক্ষম। কোনো সৃষ্টি তাঁর সদৃশ নয়, কোনোকিছুর সাথে তাঁর তুলনা হয় না।

> দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, তিনিই সকল দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। (সূরা আনআম, ৬ : ১০৩)

> কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়।; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা, ৪২ : ১১)

> কাজেই তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করো না। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৭৪)

এরকম আরেকটি দিক হলো সৃষ্টির সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ক। কুরআনে বলা হয়েছে,

> যাকারিয়া বললেন, ‘হে আমার রব!; আমার পুত্র হবে কীভাবে? আমার তো বার্ধক্য এসে গিয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।’ তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘এভাবেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সম্পন্ন করে থাকেন।’ (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪০)

> মারইয়াম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক!; কীভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি।’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই’, আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, “হও”, ফলে তা হয়ে যায়।’ (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪৭)

লক্ষ করুন, এই আয়াতে কী বলা হচ্ছে। হও, আর তা হয়ে যায়—‘কুন, ফাইয়াকূন’। এখানে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কুরআনে এ ঘটনাগুলোর কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এগুলো কীভাবে হয়েছে, এগুলোর ধরন কী, তা বলা হয়নি। কারণ এই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শূন্য থেকে কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ চেষ্টা যারাই করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। তাদের আলোচনা গিয়ে ঠেকেছে দুর্বোধ্যতা, পরস্পর বিরোধিতা আর অযৌক্তিকতায়। অথবা তারা এনেছে নিতান্তই মানুষিক ব্যাখ্যা।

মানবীয় বুদ্ধিমত্তার নাগালের বাইরে থাকা বিষয়ের মধ্যে আছে রূহের বাস্তবতা। কুরআন থেকে রূহের তিনটি অর্থ পাওয়া যায়—জীবন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এবং ওহি। তিনটির কোনোটির বাস্তবতাই আমাদের পক্ষে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়।

> আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, ‘রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (একটি হুকুম)। আর তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে অতি সামান্যই।’ (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮৫)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে গায়িব বা অদৃশ্যের জগৎ। এ জগৎ মানুষের কাছ থেকে লুকানো। এ জগৎ থাকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। তবে আল্লাহ চাইলে তাঁর বান্দাদের কারও কারও কাছে এর অল্প কিছু বিষয় প্রকাশ করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়িবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। (সূরা আনআম, ৬ : ৫৯)

> একমাত্র তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত।... (সূরা জিন, ৭২ : ২৬-২৭)

> কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (সূরা লোকমান, ৩১ : ৩৪)

গায়িব বা অদৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলো কিয়ামাতের সময়। কুরআনে বলা হয়েছে,

নিশ্চয় কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে... (সূরা লোকমান, ৩১ : ৩৪)

তারা আপনাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, 'তা কখন ঘটবে?' তা আলোচনার কী জ্ঞান আপনার আছে? এর পরম জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে, আপনি তো কেবল তাকে সতর্ককারী, যে একে ভয় করে। যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে! (সূরা নাযিআত, ৭৯ : ৪২-৪৬)

বরং তা তাদের ওপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। অতঃপর তারা তা রোধ করতে পারবে না, আর তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৪০)

মানবীয় উপলব্ধির নাগালের বাইরে থাকা এ বিষয়গুলো কীভাবে গ্রহণ করা উচিত, মহান আল্লাহ তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহ্কাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্'। কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। মূলত এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।

যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে—,'আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেকসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।'

'হে আমাদের প্রতিপালক!, সৎপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।' (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৭-৮)

কাজেই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউতে এমন বেশ কিছু বিষয় আছে, যেগুলো পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করা মানুষের জন্য অসম্ভব। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো—মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্যের সামনে আত্মসমর্পণ করা। তবে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অন্যান্য এমন অনেক দিক আছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে কুরআন এবং সৃষ্টিজগতের মাঝে থাকা তাঁর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা করতে আহ্বান করেছেন। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন দেখতে, নিরীক্ষণ করতে, জানতে ও বুঝতে। তারপর সেই শিক্ষা ও উপলব্ধিগুলো বাস্তবায়ন করতে চিন্তা ও বস্তুর জগতে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ব্যক্তি ও মানবজাতির জন্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজের বিভিন্ন পথ খুলে দেয়। ইসলাম মানুষের বুদ্ধিমত্তা, চেতনা ও উপলব্ধিকে জাগ্রত করে, মহান সত্যের আলোকে মানুষের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে। কুসংস্কার, অর্থহীন বিশ্বাস আর পুরোহিতন্ত্র মুক্ত করে তাকে উদ্বুদ্ধ করে গঠনমূলক কাজে। একই সাথে ইসলাম মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে রক্ষা করে তার নাগালের বাইরে থাকা সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে। তাকে নিরাপদ রাখে বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা আর জল্পনাকল্পনার গোলকধাঁধা থেকে। আর কোনো ধর্ম এটি করতে পারে না। আর কোনো ধর্ম—প্রকৃতি, বস্তুজগৎ এবং মানুষের সত্তার মধ্যে বিরাজমান মহান আল্লাহর তৈরি নিয়মগুলোর কার্যকরণ এবং এগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনা অনুসন্ধানের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেনি। মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে প্রশিক্ষিত করে একে সঠিক পথে রাখার ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের পেছনে ছুটো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর—এর প্রতিটির ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৩৬)

হে মুমিনগণ!, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান পাপের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)

আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোনো কার্যকারিতা রাখে না। (সূরা

ইউনুস, ১০ : ৩৬)

এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২০)

ইসলাম বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন এবং ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মহান আল্লাহর নিয়ম জানার দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সময়ের স্রোতে প্রকাশ পাওয়া আল্লাহর বিধানগুলোর ব্যাপারে সচেতন হবার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

বলুন, 'তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো। অতঃপর প্রত্যক্ষ করো, কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, অতঃপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২০)

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা শক্তিতে ছিল এদের চেয়েও প্রবল। আর তারা জমি চাষ করত এবং তারা এদের আবাদ করার চেয়েও বেশি আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি জুলুম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি জুলুম করত। তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। (সূরা রূম, ৩০ : ৯-১০)

তারা কি দেখে না যে, আমরা এ জমিনকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? (সূরা রা'দ, ১৩ : ৪১)

এমন অসংখ্য উদাহরণ কুরআনে এসেছে। মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার ও প্রশিক্ষিত করার এক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি আমরা ইসলাম থেকে পাই। সামনের অধ্যায়গুলোতে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হবে।

মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা মানুষের সক্ষমতা, প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানেন। তিনি জানেন, বস্তুজগতের বিধানগুলো বোঝার জন্য এবং খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনে ঠিক কতটুকু সক্ষমতা মানুষের প্রয়োজন। তিনি জানেন, জীবনের বিভিন্ন দিক; যেমন : মন, রূহ, মস্তিক এবং সেগুলোর কার্যকরণ, যেগুলো মানুষের কাছ থেকে লুকানো। আজও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সম্পর্ক আমাদের অজানা। শরীরবৃত্তীয় অনেক বিষয়েও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ড. অ্যালেক্সিস কারেল তাঁর Man, the Unknown (অজানা মানুষ) নামের বইতে এ বিষয়টি খোলাখুলি স্বীকার[2] করেছেন :

'নিজেকে জানার জন্য মানবজাতি ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মানুষকে নিয়ে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি আর মরমী সাধকদের সংগ্রহ করা অসংখ্য পর্যবেক্ষণের সমৃদ্ধ ভান্ডার আমাদের আছে। তবু আমরা নিজেদের ব্যাপারে খুব অল্পই জানতে পেরেছি। আমরা আজও মানুষকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম নই। আমরা তাকে জানি পৃথক পৃথক অংশ আর উপাদানের সমষ্টি হিসেবে। আর এই অংশগুলোও আমাদের পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্ট। আমরা সবাই ছায়ার মিছিল তৈরি করেছি, যার ভেতরে অজানা বাস্তবতার পদচারণা।

আমাদের অজ্ঞতা প্রগাঢ়। যারা মানুষ নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তাদের উত্থাপিত অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার বিশাল বিশাল অঞ্চল আজও অজ্ঞাত।

সময়ের শরীরবৃত্তীয় আর মানসিক উপলব্ধির ধরন কী?

আমরা জানি, মানুষ বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তরল পদার্থ আর সচেতনতার সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু সচেতনতা আর চিন্তার সাথে মস্তিষ্কের ঠিক কী সম্পর্ক, তা আজও আমাদের কাছে রহস্যাবৃত।

ইচ্ছাশক্তি কি জীবজগৎকে প্রভাবিত করতে পারে? শরীরের অবস্থা দ্বারা মন কীভাবে প্রভাবিত হয়?

> পরিবেশ, জীবনধারা, খাবারের উপাদান, শারীরিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার কারণে জন্মসূত্রে পাওয়া শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে প্রভাবিত পরিবর্তিত হয়?
>
> আমরা মানুষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে সুখের প্রবণতা তৈরি করতে পারি না। আমরা আজও জানি না, সভ্য মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের জন্য কোন পরিবেশ সর্বোত্তম। আমাদের শরীরবৃত্তীয় এবং আধ্যাত্মিক গঠন থেকে সংগ্রাম, প্রচেষ্টা এবং কষ্টকে কি দমিয়ে রাখা সম্ভব? কীভাবে আধুনিক সভ্যতায় মানুষের অবক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব?
>
> আমরা জানি না।
>
> এমন আরও অনেক প্রশ্ন করা সম্ভব। সেগুলোও উত্তরহীন থেকে যাবে। বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রগুলো গবেষণার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মানুষ নিয়েছে, সেগুলোর অর্জন অপর্যাপ্ত, এ কথা স্পষ্ট। নিজেদের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান এখনো একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে।"[3]

এই হলো মানবপ্রকৃতি নিয়ে আমাদের অজ্ঞতার অবস্থা। মানবপ্রকৃতির জ্ঞান যেকোনো বিশ্বাসব্যবস্থার আবশ্যকীয় উপাদানগুলোর অন্যতম। অথচ এ ক্ষেত্রে আমাদের অজানার পরিমাণ এখনো অনেক। একদম ছোট্ট বিষয় থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমরা বলতে গেলে কিছুই জানি না। এটা আমার কথা নয়, একথা বলছেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীদের একজন।

আধুনিক মানুষের এই অজ্ঞতার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। তবে অ্যালেক্সিস কারেলের মতে, এই অজ্ঞতার পেছনে বিশেষ ভূমিকা আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা, মানবপ্রকৃতির মধ্যে থাকা জটিলতা এবং আমাদের মনের গঠনকাঠামোর।[4] প্রথম দুটির ব্যাপারে কারেলের ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। তবে তৃতীয় কারণটি নিয়ে তার আলোচনার দিকে আমরা তাকাব। কারেল বলছেন,

> নিজেদের নিয়ে আমাদের জ্ঞানের এই ধীর গতির পেছনে আরেকটি কারণ আছে। আমাদের মন সহজ-সরল তথ্য নিয়ে ভাবতে পছন্দ করে। এভাবেই আমাদের মনের কাঠামো গড়ে উঠেছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণীর গঠনের মতো জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করাটা আমাদের মনের পছন্দ নয়। বুদ্ধিমত্তার সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো জীবনকে উপলব্ধি করার অক্ষমতা। আমাদের চিন্তার জগতে যেসব জ্যামিতিক আকৃতি আছে, সেগুলোকেই আমরা মহাবিশ্বের মধ্যে দেখতে পছন্দ করি। নির্ভুল মাপজোক আর হিসেব করে বানানো মনুমেন্ট আর মেশিনগুলো আমাদের মনের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানান দেয়। কিন্তু মহাবিশ্বে জ্যামিতির অস্তিত্ব নেই, জ্যামিতির উৎপত্তি আমাদের মনে। প্রকৃতির মাঝে মানুষের মতো চুলচেরা মাপজোক আর হিসাবনিকাশ দেখা যায় না। আমরা যেমন সহজ-সরলভাবে চিন্তা করি, তেমনটা পাওয়া যায় না মহাবিশ্বে। তাই মহাবিশ্বের জটিলতাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমাদের মনের মধ্যে থাকা সহজ-সরল কোনো ছকের মধ্যে ফেলে, যে ছকের উপাদানগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক গাণিতিক সূত্রের মতো স্পষ্ট।
>
> বিমূর্ত চিন্তার এই সক্ষমতার কারণেই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে এত অগ্রগতি এসেছে। জীব ও জড়; দুধরনের জগতেই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের নিয়মগুলো এক। জৈবরাসায়নিক দিক থেকে মানুষের ব্যাপারে অনুসন্ধান প্রায় অন্য কোনো বস্তু নিয়ে অনুসন্ধানের মতোই। এ কারণেই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মতো শরীরতত্ত্ববিদ্যার (physiology) ক্ষেত্রেও সাফল্য এসেছে।
>
> কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন এবং মেকানিক্সের তুলনায় মানুষের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি অল্পই। এর কারণ আমাদের পূর্বপুরুষের জীবনে অবসরের অভাব, আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা এবং আমাদের মনের গঠনকাঠামো। এই মৌলিক প্রতিবন্ধকতাগুলো পার হবার জন্য কঠোর চেষ্টার প্রয়োজন। নিজেদের নিয়ে আমাদের জ্ঞান কখনোই পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের মতো সরল, সুন্দর, বিমূর্ত এবং পরিপাটি হবে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের অগ্রযাত্রা যেসব কারণে ব্যাহত হয়েছে, হুট করে সেগুলো দূর হবার সম্ভাবনাও কম। আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার, মানুষের ব্যাপারে বিজ্ঞান হলো

বিজ্ঞানের সবচেয়ে দুর্দূরূহ শাখা।[5]

এই আলোচনা থেকে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটা বোঝা যায়। অ্যালেক্সিস কারেলের সব অবস্থানকে আমরা সমর্থন করি না। কারেল বেড়ে উঠেছিলেন পশ্চিমা সমাজে। তার চিন্তার কাঠামো এবং ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে পশ্চিমা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি', আর 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা'র আলোকে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমা চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলো তাঁর চিন্তায় ছাপ ফেলেছে। তাঁর বইয়ের শুরুতে এ কথা স্বীকার করেছেন তিনি নিজেই। তবু তাঁর কথাগুলো প্রাসঙ্গিক। কারণ কারেল এই অজ্ঞতার প্রধান কারণকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। আর তা হলো, আমাদের মন ও বুদ্ধিমত্তার গঠন।

যেমনটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি, দুনিয়াতে মানুষের ভূমিকা হলো মহান আল্লাহর খলীফা হওয়া। এই ভূমিকা পালনের উপযোগী করে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের মন বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান আর বস্তুকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি জানতে সক্ষম। মানুষের বাস্তবতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ও আমাদের মন জানতে পারে। কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের রহস্য, জীবনের রহস্য, রূহের বাস্তবতার মতো কিছু দিক মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাবে সবসময়। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষের মূল যে ভূমিকা, তা পালনে এই বিষয়গুলোর জ্ঞান জরুরি নয়।

ওপরের এই আলোচনা থেকে দুটো বিষয় বের হয়ে আসে—

প্রথমত, মহান আল্লাহ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে মানুষকে একাকী ছেড়ে দেননি। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে নিজে নিজে আকীদা তৈরির দায়িত্ব মানুষের ঘাড়ে দেননি আল্লাহ। বরং তিনি মানুষকে দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক ওয়ার্ল্ডভিউ। যে ওয়ার্ল্ডভিউ শুধু মানুষের বাস্তবতার ব্যাপারে নয়; বরং স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের জানায় এবং নির্দেশনা দেয়। নিজে নিজে মূল্যবোধ, জীবনব্যবস্থা ও আইন তৈরির দায়িত্বও আল্লাহ মানুষকে দেননি। এমন কিছু তৈরি করতে প্রয়োজন মানবপ্রকৃতির ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান। প্রয়োজন জীবন ও মহাবিশ্বের প্রকৃতি এবং স্রষ্টার বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের নেই এবং এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, অতীত ও বর্তমানের যারাই মানবজীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, মানব সম্প্রদায়ের জন্য নিয়মনীতি, আইন এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করেছে, তাদের ঔদ্ধত্যের মাত্রা বিস্ময়কর। এধরনের চেষ্টা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবপ্রকৃতি নিয়ে মানুষের জ্ঞান প্রাথমিক পর্যায়ের। অন্যান্য বড় বড় বাস্তবতা নিয়ে তার জ্ঞান আরও সীমিত। এত সীমিত সামর্থ্য দিয়ে কীভাবে এত বড় নির্মাণ সম্ভব? যারা এধরনের চেষ্টা করেছে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার স্তূপে বাতিল ধ্যানধারণার সংখ্যা বাড়িয়েছে কেবল। ভুল চিন্তার ওপর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা আর কলুষিত পদ্ধতি তৈরি করে পৃথিবীতে দুঃখদুর্দশা বাড়িয়েছে। মানুষের ঔদ্ধত্যের তিক্ত ফল এমনই হয়। আর তাদের ঔদ্ধত্যের কারণ কেবল তাদের অজ্ঞতাই।

মহান আল্লাহর নাযিল করা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এক অমূল্য নিয়ামাত। নিজে নিজে পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ল্ডভিউ তৈরি করা মানুষের জন্য অসম্ভব। এই রাজ্যে বিচরণের মতো সক্ষমতা, উপকরণ কিংবা উপাদান নেই মানুষের। এই ব্যর্থ প্রকল্পের পেছনে সময় ও শক্তি নষ্ট করা থেকে ইসলাম মানুষকে রক্ষা করেছে। মানুষকে সুযোগ করে দিয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই নিয়ামাতকে বোঝার এবং এর ছকে নিজের জীবনকে সাজানোর। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে ধ্রুব মাপকাঠিতে নিজের আচরণ ও মূল্যবোধগুলো যাচাই করার, আসমানি নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলার। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হলে নিশ্চিতভাবেই মানুষ ভ্রান্তিতে পতিত হবে। ফলাফল হিসেবে পাওয়া যাবে বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার ধ্বংসস্তূপ, যে স্তূপের নিচে ইসলামের আবির্ভাবের আগে মানবজাতি চাপা পড়ে ছিল। আবর্জনার এই স্তূপ কোনো সমাধান দিতে পারবে না, মানুষকে কেবল ঠেলে দেবে উন্মাদনা আর বিভ্রান্তির গহিনে। গভীর বিভ্রান্তি আর ভুলের ওপর গড়ে তোলা জীবনব্যবস্থা দুঃখদুর্দশা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।

এ ব্যাপারে উস্তাদ আবুল হাসান আলি নাদভি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো নামক মূল্যবান বইতে বলেছেন,

নবি-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানুষকে আল্লাহর যাত, সিফাত ও কার্যাবলির ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান দান করেছিলেন।

> তাঁরা ওই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়েছিলেন, যার ওপর মানুষ তার গবেষণার প্রাসাদ দাঁড় করাতে পারে। নিষ্ফল দার্শনিক আর ধর্মতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক থেকে মানুষকে তাঁরা মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ তাতে কর্ণপাত করেনি।
>
> ওহির দিকনির্দেশনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে মানুষ বরং অপ্রয়োজনীয় এক অভিযানের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিল। অজানা সমুদ্রে সে ছেড়ে দিলো নিজের চিন্তার জাহাজ। যে মৌলিক সত্য আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-এর মাধ্যমে সে জানতে পেরেছিল, তা নিয়ে আবার গোড়া থেকে গবেষণা শুরু করল সে।
>
> সে ওই অভিযাত্রীর চাইতেও দুর্ভাগা, যে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তৈরি করা মানচিত্র ও ভূগোলের জ্ঞান সরিয়ে রেখে নিজেই সব পাহাড়ের উচ্চতা আর সমুদ্রের গভীরতা নতুন করে মাপতে শুরু করে। এমন ব্যক্তি কেবল গুটিকয়েক চিরকুট আর অপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিতের পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে, আর কিছুই নয়। যারা নবিদের শিক্ষার আলো ছাড়া কেবল যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর ব্যাপারে ব্যাখ্যা তৈরার চেষ্টা করেছে, তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে। তারা যা কিছু জড়ো করেছে, সেগুলো পরস্পরবিরোধী মত, অপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্য, আকস্মিক ধ্যানধারণা ও তাড়াহুড়োর দর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। তারা নিজেরাও পথ হারিয়েছে, অন্যদেরও বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে।[6]

স্রষ্টা, মানব অস্তিত্ব, মহাবিশ্ব এবং এগুলোর সম্পর্কের ব্যাপারে নিজে নিজে বিশ্বাস বা দার্শনিক ব্যাখ্যা তৈরি করতে চাওয়া লোকদের অবস্থা আসলে উস্তাদ নাদভি বর্ণিত অভিযাত্রীর চেয়েও খারাপ। এধরনের প্রচেষ্টা মানবজাতির জন্য আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক। তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হলো আসমানি কিতাবের শিক্ষাকে বিকৃত করা। বিশেষ করে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর শিক্ষাকে ইউরোপের চার্চ যেভাবে বিকৃত করেছে, তা মানবজাতির জন্য ভয়ংকর সব পরিণতি নিয়ে এসেছে। এই বিকৃত শিক্ষাকে ব্যবহার করে ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপের ওপর কর্তৃত্ব করেছে, শক্তির জোরে চাপিয়ে দিয়েছে নানা বাতিল ধ্যানধারণা, নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে খাপ না খাওয়ার কারণে বন্ধ করতে চেয়েছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে। ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর আনা বিশুদ্ধ শিক্ষার সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই, সত্য। তবে এই জুলুম এবং অন্যায় ধর্মের নামেই হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে; কারণ ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসা আসমানি শিক্ষার মধ্যে মানবীয় ধ্যানধারণা প্রবেশ করানো হয়েছে। ফলে এই শিক্ষা হয়ে গেছে বিকৃত, পরস্পরবিরোধী এবং দুর্বোধ্য।

আইডিয়ালিসম, পসিটিভিসম, ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিসমসহ[7] সব ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তি হলো —ধর্ম এবং ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহের জন্ম হয়েছে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর আনা বিশুদ্ধ শিক্ষাকে বিকৃত করার কারণে। আসমানি শিক্ষার সাথে মানবরচিত ধ্যানধারণার মিশ্রণ যে কতটা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক হতে পারে, তা এ থেকে বোঝা যায়। মানবজাতির ওপর আজ যেসব বিপর্যয় আপতিত হয়েছে, সেগুলো বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে মানবীয় চিন্তার মিশ্রণের ফল, একথা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা সম্ভব।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাস নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা দরকার। আমরা যেসব আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা দেখি, সেগুলো আসলে আসমানি শিক্ষার সাথে মানবরচিত ধ্যানধারণার মিশ্রণের ফলে তৈরি হওয়া দূষণের প্রতিক্রিয়া। আর এই দূষণ হয়েছিল ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থের অধীনস্থ করার কারণে এবং ইউরোপের জাতিগত ও পৌত্তলিক ঐতিহ্যের প্রভাবে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বিকৃতি থেকে রক্ষার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের কত মূল্যবান নিয়ামাত দিয়েছেন, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে হয়তো তা বোঝা আমাদের জন্য সহজ হবে। খ্রিষ্টবাদকে দূষণমুক্ত করার জন্য রিফর্মেইশান, প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের উদ্ভব, ধর্মীয় সংস্কার-এর মতো অনেক কিছুই হয়েছে। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বেলায় এর কোনোকিছুরই প্রয়োজন নেই। এই ওয়ার্ল্ডভিউ আজও বিশুদ্ধ, আজও মানবীয় ভুলত্রুটি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত। এই ওয়ার্ল্ডভিউ আজও মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। হিদায়াহ, স্বস্তি, শান্তি ও সন্তুষ্টির উৎস।

এখানে মুহাম্মাদ আল-বাহি এর বই Modern Islamic thought and its connection with Western colonialism (আধুনিক ইসলামি চিন্তা ও এর সাথে পশ্চিমা উপনিবেশবাদের সম্পর্ক)-এর একটি প্রবন্ধ 'Is Religion a Drug?' (ধর্ম কি মাদক?) থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা যথাযথ হবে।[8] ইউরোপীয় চিন্তা কীভাবে চার্চ বিরোধী হয়ে উঠল এ প্রবন্ধে মুহাম্মাদ আল-

বাহি তা তুলে ধরেছেন। 'ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে ধর্ম, যুক্তি এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সংঘাতের ইতিহাস' উপ-শিরোনামের অধীনে আল-বাহি লিখেছেন,

> 'চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপীয় চিন্তা বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাতের চারটি পর্যায় অতিক্রম করে। এই সংঘাতের কেন্দ্রে ছিল জ্ঞানের উৎস নিয়ে তর্ক। মানবজাতির ইতিহাসে মোটা দাগে জ্ঞানের তিনটি উৎস পাওয়া যায়—ধর্ম, মানবীয় বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধিজাত জ্ঞান। ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাতের চারটি পর্যায়ের প্রতিটিতে জ্ঞানের উৎস হিসেবে এ তিনটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই উৎসগুলোর গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা নিয়ে তর্কবিতর্কের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন চিন্তাধারা।
>
> ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব : মধ্যযুগের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে ছিল ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য। জীবনের বিভিন্ন দিক পরিচালনা, মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করাসহ সব ক্ষেত্র ছিল ধর্মের অধীনে। এই ধর্ম ছিল খ্রিষ্টধর্ম, আরও নির্দিষ্ট করে বললে খ্রিষ্টধর্মের ক্যাথলিক ধারা। ক্যাথলিকবাদ যাজকতন্ত্র নামেও পরিচিত, খ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে পোপ যেখানে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ' ব্যাখ্যা করার এখতিয়ার ছিল পোপ আর অল্প কিছু উচ্চপদস্থ যাজকের। ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বলতে ক্যাথলিক চার্চের বক্তব্যকেই বোঝানো হতো। ক্যাথলিক চার্চ ট্রিনিটির আকীদা তৈরি করল, স্বীকারোক্তি আর ইনডালজেন্সের[9] মতো বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের ভেতরে নিয়ে এল। নিজেদের পছন্দমতো ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করালো বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান।
>
> এ অবস্থা চলল পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ততদিনে মুসলিমদের কাছ থেকে শেখা বিভিন্ন ধারণা ইউরোপে এসে পৌঁছেছে ক্রুসেডারদের মাধ্যমে এবং ধীরে ধীরে ইউরোপের চিন্তা বদলাতে শুরু করেছে। ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ক্যাথলিক চার্চের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসল মার্টিন লুথার (১৪৫৩-১৫৪৬)। শুরু করল ক্যাথলিক চার্চের 'শয়তানী শিক্ষা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সে ইনডালজেন্সের বিরোধিতা করল, ট্রিনিটি এবং পোপের মা'সূম হবার শিক্ষার বিরুদ্ধেও অবস্থান নিল। লুথারের মতে এগুলো জনগণের দাসত্বকে দীর্ঘায়িত করছিল কেবল। মার্টিন লুথার ঘোষণা করল—বাইবেলই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। সবার বাইবেল পড়ার ও বোঝার স্বাধীনতা দাবি করল সে। তবে লুথার চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেনি। লুথারের মতে, বিশ্বাসের উৎস হলো বাইবেল। যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস প্রাধান্য পাবে। লুথারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এল ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪)। সে-ও বলল, 'প্রকৃত খ্রিষ্টবাদের' একমাত্র সত্য উৎস বাইবেল। পোপদের দেওয়া ট্রিনিটির ব্যাখ্যা সঠিক খ্রিষ্টীয় শিক্ষা নয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ। লুথার আর ক্যালভিন পোপীয় ক্যাথলিকবাদের সংস্কার চাইছিল, তারা খ্রিষ্টধর্মের বিরোধী ছিল না। নিজেদেরকে তারা খ্রিষ্টধর্মের সংস্কারক মনে করত।
>
> লুথার ও ক্যালভিনের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে, অর্থাৎ ক্যাথলিকবাদ এবং পোপতন্ত্র নিয়ে শুরু হলো বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব আর তর্কবিতর্ক। এসময়কার ধর্মের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা দার্শনিকরা মূলত পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করত। ধর্ম আর যুক্তির সাংঘর্ষিকতা বলতে তারা বোঝাত ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষার সাথে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির সংঘাতকে। তারা ট্রিনিটি নিয়ে ক্যাথলিক চার্চের ব্যাখ্যা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ইনডালজেন্স বিক্রির মতো নানা বিষয়ের সমালোচনা করত। ইউরোপের দার্শনিকদের মধ্যে পরে যারা খ্রিষ্টবাদের পক্ষে বলেছে; যেমন হেগেল।, তারা ক্যাথলিক চার্চের বিকৃত শিক্ষার বিপরীতে লুথারের প্রচারিত 'বিশুদ্ধ' শিক্ষার কথা বলত। কাজেই এসময়কার ইউরোপীয় দর্শনে যখনই ধর্ম শব্দটা ব্যবহার হয়, তখন সেটা খ্রিষ্টধর্মের এই নির্দিষ্ট রূপ (ক্যাথলিক)-কে বোঝায়।
>
> এভাবে ইউরোপে ধর্ম এক বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হলো। তবে এটি ছিল এক নির্দিষ্ট ধর্মের একটি নির্দিষ্ট রূপ। দর্শনের নামে কিছু বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হলো, আবার কিছু বিশ্বাসকে অস্বীকার করা হলো।
>
> বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব : জ্ঞানের অন্য সব উৎসের ওপর ধর্মগ্রন্থের প্রাধান্যের পর্যায় চলল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। তারপর ইউরোপের দিগন্তে দেখা দিলো এনলাইটেনমেন্টের যুগ। অর্ধ শতাব্দীর মতো স্থায়ী হওয়া এনলাইটেনমেন্টের যুগের এমন

কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাকে আগে-পরের পর্যায়গুলো থেকে আলাদা করে। এই সময়কার বিভিন্ন ফরাসি, জার্মান এবং ইংরেজ দার্শনিকরা এনলাইটেনমেন্টের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন। এনলাইনমেন্টের সময়কার চিন্তায় তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য আছে :

১. এনলাইটেনমেন্ট চিন্তা মানবীয় বুদ্ধিমত্তার গুণকীর্তন করে। এনলাইটেনমেন্ট বলে—একবার অতীতের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব ভেঙে, সব প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যৎ থাকবে মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রগতির পথ তখন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

২. এনলাইটেনমেন্ট চিন্তা সব ঐতিহাসিক ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা করতে চায়। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, আইন, শিক্ষা, ধর্ম—সব গড়ে তুলতে চায় মানবীয় যুক্তির কাঠামোর ওপর।

৩. এনলাইটেনমেন্ট চিন্তা মানবজাতির সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়। এ চিন্তা অনুযায়ী, মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে সমাধান আসবে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে। নতুন সভ্যতার ভিত্তি হবে মানবীয় বুদ্ধিমত্তা আর যুক্তি। এভাবে মানবজাতি এগিয়ে যাবে প্রগতির পথে।

এই সবকিছুর সারাংশ হলো : ধর্মের ওপর যুক্তি বা মানবীয় বুদ্ধিমত্তা প্রাধান্য পাবে। আবারও বলি, ধর্ম বলতে তারা বোঝাত ক্যাথলিকবাদ এবং প্রটেস্ট্যান্টবাদকে, অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মকে। এনলাইটেনমেন্ট চিন্তা বলত :

> মানবীয় বুদ্ধিমত্তার অধিকার আছে রাজনীতি, আইন, ধর্মসহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক ও চূড়ান্ত পথ প্রদর্শনকারী হবার। জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানবতা।

এই সময়কালকে এনলাইটেনমেন্টের যুগ, মানবতাবাদের যুগ ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। কেউ কেউ একে Age of Deism-ও বলত। এনলাইটেনমেন্টের সময়কার অনেক দার্শনিক এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল, যে ঈশ্বর মহাবিশ্বের স্রষ্টা নয় এবং কোনো ওহিও যে নাযিল করে না। এই ঈশ্বর মানুষের জীবন নিয়ে মাথা ঘামায় না। একেই Deism বলা হয়।[10]

এই সবগুলো নাম আসলে মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। এনলাইটেনমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে কর্তৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে, সেখানে বুদ্ধিমত্তাকে বসানো। ধর্ম মতে, চূড়ান্ত কল্যাণ হলো স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন। এর বিকল্প হিসেবে এনলাইটেনমেন্টে চূড়ান্ত কল্যাণ বানানো হলো মানবতাবাদকে। এনলাইটেনমেন্ট এমন এক ঈশ্বরের কথা বলল, যে সৃষ্টি করে না, নিজেকে প্রকাশও করে না। মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব দেওয়ার অবস্থানের সাথে এই নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরের ধারণা বেশ ভালোভাবে খাপ খেয়ে গেল।

ধর্মের শিক্ষা এবং যুক্তির উপসংহারের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকল। ইউরোপের চিন্তায় ধর্ম আর বুদ্ধি হাজির হলো একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে। আগের পর্যায়ে ধর্মের মাধ্যমে বুদ্ধিকে বশীভূত করার ঝোঁক ছিল। এ পর্যায়ে সেটা উলটে গিয়ে, ধর্মকে যুক্তির মাধ্যমে বশীভূত ও দমন করার নিরলস প্রচেষ্টা চলল। আগের পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।

এনলাইটেনমেন্টে যেটাকে ধর্ম আর যুক্তির সংঘাত বলা হচ্ছিল, আসলে সেটা খ্রিষ্টবাদ আর চার্চের শিক্ষার সাথে যুক্তির সংঘাত। এই সংঘাত তৈরি হয়েছিল ক্যাথলিক চার্চের তৈরি করা জীবনব্যবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে। যেসব ক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি ছিল; যেমন : বিশ্বাস, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজনীতি, আইন; সেখানেই ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে সংঘাত সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠল।

ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব : উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এনলাইটেনমেন্টের যুগ শেষ হলো। কিন্তু পুরনো সেই বিতর্ক জারি রইল।

ধর্ম, যুক্তি, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান—জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাধান্য পাবে কোনটি? ধর্ম ও যুক্তিকে ফেলে ইউরোপ এবার ঝুঁকল ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের দিকে। সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হিসেবে ধর্ম ও যুক্তির ওপর ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে একটি দর্শন অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠল। এই দর্শনের নাম ছিল পসিটিভিসম (positivism) এবং এর সূচনা হয়েছিল জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি তত্ত্ব হিসেবে।

জ্ঞানের এই দর্শন গড়ে উঠেছিল চিন্তার এক নির্দিষ্ট আবহাওয়ায়। ক্যাথলিক চার্চ একটি নির্দিষ্ট ধরনের জ্ঞানের একচ্ছত্র মালিকানা দাবি করত। বিরোধীদের মোকাবিলায় এই জ্ঞানকে কাজে লাগাত ইচ্ছেমতো। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিজ্ঞানী, গবেষকসহ সবার ওপর তার নিজস্ব শিক্ষা চাপিয়ে দিয়েছিল চার্চ। তাই ইউরোপের অনেক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ চার্চের কর্তৃত্ব ও এই জ্ঞানের বিরোধিতার অবস্থান গ্রহণ করল।

চার্চ যে নির্দিষ্ট ধরনের জ্ঞান ব্যবহার করে নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখছিল, তা ছিল খ্রিষ্টীয় বা ক্যাথলিকবাদের জ্ঞান। আরেকটু ব্যাপকভাবে দেখলে, একে ধর্মীয় বা মেটাফিযিক্যাল জ্ঞানও বলা যেতে পারে। পসিটিভিস্টরা তাই শুধু চার্চের শিক্ষাগুলোর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করল না, বরং বিদ্রোহ করে বসল সব ধর্মীয় শিক্ষা, এমনকি সব ধরনের মেটাফিযিক্যাল শিক্ষার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি -পসিটিভিস্টরা এনলাইটেনমেন্টের 'র‍্যাশনালিসম' এবং 'আইডিয়ালিসম'-এর অবস্থানেরও বিরোধিতা করল। এনলাইটেনমেন্টের এই আদর্শগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে সরিয়ে লক্ষ্য হিসেবে মানবতাবাদ এবং মানবকল্যাণকে স্থাপন করা। কিন্তু পসিটিভিস্টরা মনে করত, এনলাইটেনমেন্টের এই আদর্শগুলো তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

পসিটিভিস্টরা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান বলতে কী বোঝাত? আসলে তথ্য, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক ঘটনা, বাস্তবতা– পসিটিভিস্টদের কাছে এই সবগুলো শব্দের অর্থ একই। তাদের মতে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য-উপাত্তই প্রকৃত জ্ঞান। অর্থাৎ প্রকৃতিই হলো জ্ঞানের একমাত্র নিশ্চিত উৎস।

পসিটিভিস্টরা প্রকৃতিকে কেবল জ্ঞানের স্বাধীন উৎস হিসেবে দেখত না, তাদের কাছে প্রকৃতিই ছিল সুনিশ্চিত এবং সত্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস। প্রকৃতি মানুষের মনে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। তার নিজস্ব পদ্ধতি, সংকেত, ইঙ্গিত এবং বার্তার মাধ্যমে প্রকৃতি এটি তৈরি করে। মানুষের মনও প্রকৃতির তৈরি। প্রকৃতিই মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়, স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়। প্রকৃতিই মানুষের বুদ্ধিমত্তার স্রষ্টা।

পসিটিভিস্টদের মতে, ঘটনার জগতের বাইরে আর কোনোকিছুই জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না। মানুষের নিজের ভেতরেও এমন কিছু নেই, যা তাকে সত্য বা বাস্তবতার ব্যাপারে জানাতে পারে। যা কিছু অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে আসার দাবি করে, তার সবই মিথ্যা ও প্রতারণা। আর যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার তৈরি, তা হলো নিছক জল্পনাকল্পনা। ধর্ম যেহেতু অতিপ্রাকৃত উৎস থেকে আসার দাবি করে, তাই ধর্ম প্রতারণা ছাড়া কিছু হতে পারে না। আর র‍্যাশনালিস্ট আইডিয়ালিসমের মতো এনলাইটেনমেন্ট দর্শনগুলোর সাথে বস্তুজগতের কোনো সম্পর্ক নেই, কাজেই এগুলোও সত্যের দিশা দিতে পারবে না। পসিটিভিস্টদের মতে, চিন্তার ইতিহাসে মানবজাতি অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে। প্রাকৃতিক ঘটনার ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এমনই এক ফেলে আসা পর্যায়ের মনোভাব। একই কথা প্রযোজ্য মেটাফিযিক্যাল নানা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও। এসব সেকেলে ব্যাখ্যা আধুনিক সময়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

পসিটিভিস্টরা মনে করত—মানবতা, প্রকৃতি, মহাবিশ্বে মানুষের ভূমিকার মতো বিষয়গুলো নিয়ে ধর্মীয় জ্ঞান বা এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের জায়গা থেকে যা কিছু বলা হয়, তা অসত্য এবং অবাস্তব হতে বাধ্য। যারা এধরনের অবস্থানে বিশ্বাস করে, তারা হয় ধর্ম দ্বারা অথবা মানবীয় অহংকার থেকে উদ্ভূত কোনো বিভ্রম দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

মানবীয় বুদ্ধিমত্তা এবং এটি যে জ্ঞান ধারণ করে, তা গড়ে ওঠে মানুষের পরিবেশ, বংশগতি এবং আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রভাবে। এ সবকিছুই প্রকৃতির সৃষ্টি। কাজেই মানুষের মন সৃষ্ট। মনের সৃষ্টিকর্তা হলো ইন্দ্রিয়জাত অস্তিত্ব (sensory

existence)। মানুষের মন চিন্তা করতে পারে। কিন্তু তার চিন্তা পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান; দুটোই তার বস্তুগত অস্তিত্বের অধীন। তাই বস্তুর আগে মনের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বস্তুর আগে থাকতে পারে না মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান। বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান হলো বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কের ফলে তৈরি ইন্দ্রিয়জাত তথ্যের ফসল। প্রকৃতি তার নিজের ব্যাপারে কথা বলে, আর প্রকৃতির মাঝে থাকতে হলে মানুষকে অবশ্যই প্রকৃতির যুক্তি মেনে চলতে হবে। প্রকৃতির যুক্তিই মানবজীবনের সঠিক পথ দেখাতে পারবে। ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক কিংবা মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তি মানলে হবে না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের শুরু ব্যক্তি পর্যায়ে আর এর চূড়ান্ত বিকাশ সমষ্টিতে। ব্যক্তি নিজে তার জীবন ও কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। জীবনের পথচলার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মানবতার মাঝে, সামষ্টিকতার মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া, ঠিক যেভাবে কিছু সুফিদের উদ্দেশ্য হলো ফানা; স্রষ্টার মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। সামষ্টিকতার মুক্তির জন্য ব্যক্তি তার স্বাধীনতাকে উৎসর্গ করে। সমষ্টিই যেহেতু ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য, তাই এটি কার্যত উপাসনার বস্তুতে পরিণত হয়।

পসিটিভিসমের মূল লক্ষ্য ছিল চার্চ এবং চার্চের গড়ে তোলা জ্ঞানের বিরোধিতা করা। অন্যভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানের নামে মেটাফিযিক্স ও  আইডিয়ালিসমের বিরোধিতা করা ছিল পসিটিভিসমের উদ্দেশ্য। কিন্তু পসিটিভিসম শেষ পর্যন্ত চার্চের ধর্মকে আরেক ধর্ম দিয়ে প্রতিস্থাপন করল। পসিটিভিস্টরা নতুন এক ধর্ম আনল—সুপ্রিম হিউম্যানিটি বা পরম মানবতার ধর্ম। ক্যাথলিক চার্চের মতোই নতুন এ ধর্মের ছিল নিজস্ব পুরোহিত, সন্ত আর পবিত্র চিহ্ন।[11]

মার্ক্সবাদ-:[12]: -মার্ক্সের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পসিটিভিস্ট দার্শনিক অগুস্ত কন্টের[13] চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মার্ক্সের বস্তুবাদ মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। যুক্তির আগে বস্তুর অস্তিত্ব ছিল, এমনটাও দাবি করে না। মার্ক্সের বস্তুবাদ কেবল বলে, মনের চেয়ে বস্তু গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মন তার অস্তিত্বের জন্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

ধর্ম বলে, শারীরিক মৃত্যুর পরও মনের (আত্মা) অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু বস্তুবাদের জায়গা থেকে বস্তু ছাড়া মনের স্বাধীন অস্তিত্ব অসম্ভব। শরীর নামক বস্তুকে ছাড়া মনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ধর্মের এই অবস্থান মার্ক্স অস্বীকার করে। একই সাথে মার্ক্স প্রত্যাখ্যান করে স্রষ্টার ধারণাকেও। কারণ স্রষ্টা বলতে এমন এক চিরন্তন সত্তাকে বোঝানো হয়, যিনি বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন। একজন বস্তুবাদীর পক্ষে এটি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মার্ক্সের মতে, সব ধর্ম হলো অভিশাপ। ধর্ম হলো জনগণেরনের আফিম।

হেগেল বলেছিল, মন বাস্তব আর বস্তু হলো মনের প্রতিফলন। এই অবস্থান উলটে দিয়ে মার্ক্স বলল, বস্তুই বাস্তবতা আর মন হলো বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবি। মন এক ধরনের আয়নার মতো, যেখানে বাস্তবতার প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। বাস্তবতার এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মার্ক্সবাদী চিন্তার মূল ভিত্তি। বিভিন্ন মার্ক্সবাদী অবস্থান এই ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছে। মার্ক্সবাদের মতে সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক ঘটনাপ্রভাব সেই সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। যেকোনো সময়ে মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের মূল প্রভাবক হলো অর্থনীতি। যদিও মার্ক্স এবং এঙ্গেলস সাধারণভাবে সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার ঐতিহাসিক অর্থ অনুসন্ধানে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের মূল মনোযোগ ছিল অর্থনৈতিক অক্ষের ওপর। তাদের মতে অর্থনৈতিক অবস্থাই হলো যেকোনো সমাজের মূল চলক। সব মানবীয় কর্মের পেছনে মূল চালিকাশক্তি অর্থনীতি। কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই পারে রাষ্ট্র ও তার পলিসিকে প্রভাবিত করতে, বিজ্ঞান ও ধর্মকে প্রভাবিত করতে এবং তাতে পরিবর্তন আনতে। কাজেই সব সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন আসলে অর্থনৈতিক জীবনের শাখাপ্রশাখা শুধু। পুরো মানবজাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির ইতিহাস।’[14]

ইউরোপীয় চিন্তার সবগুলো পর্যায় আসলে চার্চের বিকৃত শিক্ষা আর ধর্মীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের কবল থেকে বেরিয়ে আসার বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলাফল। মুহাম্মাদ আল-বাহি ইউরোপীয় চিন্তার বিভিন্ন পর্যায়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে বারবার এই প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রচেষ্টা একসময় আইডিয়ালিসমের দর্শনের জন্ম দিয়েছে। এই দর্শনের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে কোনো কোনোটি সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং মানবীয় বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে, যেমন ইয়োহান ফিকটের অবস্থান।[15] কোনো

কোনো সংস্করণ ধর্মের পক্ষে কথা বললেও, স্রষ্টার নতুন ধারণা আবিষ্কার করেছে। যেমন : হেগেলের কাছে ঈশ্বর মহাবিশ্বের বাইরে কিছু নয়, বরং ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। মহাবিশ্ব হলো ঈশ্বরের সত্তার অভিব্যক্তি।[16] আবার আইডিয়ালিসমের কিছু ধারা কন্টের প্রচারিত পসিটিভিসমের দিকে গেছে এবং একসময় মার্ক্স আর এঙ্গেলসের মাধ্যমে ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়ালিসমের দিকে গেছে। এই উদভ্রান্ত পথ পরিক্রমার মূল কারণ চার্চ কর্তৃক আসমানি শিক্ষার বিকৃতি।

তবে চার্চের কবল থেকে পালাতে গিয়ে স্রষ্টার কাছ থেকেই দূরে চলে যাওয়া এই পথগুলো শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। এই সবগুলো প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। এত কাঠখড় পুড়িয়েও তারা কোনো ধারণা স্পষ্ট করতে পারেনি, পৌঁছাতে পারেনি নিরেট কোনো সত্য বা উপসংহারে। এমন কোনো মজবুত উত্তর কিংবা ফলাফল অর্জন করতে পারেনি, যার দিকে তাকিয়ে বলা যায়, 'এই তাহলে মেটাফিযিক্সের ধাঁধার জবাব!'

র‍্যাশনালিসমের দর্শনের কথাই ধরুন; এ দর্শন থেকে কোনো শুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয়েছে?

র‍্যাশনালিসমের দর্শনে যুক্তি বা মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে চূড়ান্ত মনে করা হয়। এ দর্শন বলে, স্রষ্টা কিংবা কোনো বস্তুগত ঘটনা নয়, বরং যুক্তিই হবে মানুষের পথপ্রদর্শক। প্রশ্ন হলো, এই আদর্শ যুক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? এই আদর্শ যুক্তি কেমন? কেমনভাবেই বা এটা কাজ করে? কোন কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলে? যুক্তির প্রকৃতি আর বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে কী জানে এই দর্শন? কী জানে যুক্তির কার্যকরণ নিয়ে? কোন জিনিসগুলো যুক্তিকে প্রভাবিত করে? মনের অস্তিত্ব কোথায়? অবস্থান কোথায়? কোন কোন নিয়ম দ্বারা মন চালিত হয়?

আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক কোনো উত্তর তারা দিতে পারেনি।

আইডিয়ালিসমের দর্শনের দিকে তাকান; এই দর্শনের প্রণেতা বলা যায় ইয়োহান ফিকটকে। পরে হেগেল আইডিয়ালিসমকে একটি মেটাফিযিক্যাল চিন্তাব্যবস্থায় রূপ দেয়, আর কার্ল মার্ক্স একে রূপান্তরিত করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিসমে। এই তিন ধারার সবগুলোর মধ্যে একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়।

ফিকটে মনে করত মানুষের মন বা আত্মা নিজেই তার নিজের অস্তিত্বের উৎস। মন শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করে না, বরং মন সক্রিয় কর্তা। সে নিজেকে তৈরি করে এবং ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যকে কাঠামো দেয়। বস্তু আর মন দুটো আলাদা সত্তা নয়, বরং একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মন হলো বস্তুজগতের উৎস, বস্তুজগৎ হলো মনের অভিব্যক্তির প্রকাশ। মন সক্রিয়, বস্তু নিষ্ক্রিয়।

এই চিন্তা নিয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে ফিকটে দাবি করে, মন বা আত্মার একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্বের জন্য মন অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। এমন কিছু থাকতে পারে না, যা জ্ঞানের অতীত। জানা সম্ভব, কারণ মন নিজেই জ্ঞানের এসব রূপ তৈরি করেছে। কাজেই বস্তুসহ জ্ঞানের সব লক্ষ্যবস্তু মূলত মনের দ্বারা উৎপাদিত।

লক্ষ করুন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এধরনের আলাপের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো শব্দের হাতসাফাই আর ভেলকিবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পুরো আলোচনার ভিত্তি কী? বাস্তবতার সাথে এর সম্পর্ক কী? এর পক্ষে প্রমাণ কী?

কিচ্ছু নয়। এটা স্রেফ নিজস্ব চিন্তাধারণা গঠনে ফিকটের বুদ্ধিবৃত্তিক কলাকসরত। বাস্তবতাবিবর্জিত বিমূর্ত, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তাবনা। র‍্যাশনাল আইডিয়ালিসমের বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এর কোনো উপস্থিতি কিংবা কার্যকারিতা নেই মানবজীবনে। এধরনের চিন্তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক চার্চের ঈশ্বরকে আসনচ্যুত করে সেখানে নতুন কোনো ঈশ্বরকে বসানো। এমন ঈশ্বর যার কোনো পাদ্রী নেই, পোপ নেই, চার্চও নেই। তাই 'মন' এই নতুন ঈশ্বরের রূপ নিল। কারণ মনের কোনো পাদ্রী, পোপ কিংবা চার্চের প্রয়োজন নেই।

এ তো গেল ইয়োহান ফিকটের কথা।; অন্যদিকে, হেগেলের চিন্তায় পাওয়া যায় পরম আত্মার ধারণা,+[17]

হেগেলের দর্শনে -পরমাত্মা হলো বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আধার। এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক সত্তা। পরমাত্মা নিজ সত্তাকে জগৎ রূপে প্রকাশ করে। সে একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। পরমাত্মা জীবন্ত ও গতিশীল। মন ও বস্তু দুটোই তার প্রকাশ। দুটোরই আছে স্বতন্ত্র সত্তা।

হেগেলের মতে, সাধারণত পরমাত্মার তিনটি অবস্থা আমরা দেখতে পাই। প্রথমত, বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়ত, এর বিপরীতে সৃষ্ট হয় জড়জগৎ। তৃতীয়ত, এই দুইয়ের সমন্বয়রূপে সৃষ্টি হয় ধর্ম, শিল্প ও দর্শনের। সবকিছুর মধ্য দিয়েই পরমাত্মার প্রকাশ ঘটে। পরমাত্মা জ্ঞান বা বুদ্ধিস্বরূপ। যা কিছু সৎ, সবই পরমাত্মার প্রকাশ, অর্থাৎ সবই বুদ্ধি বা জ্ঞানস্বরূপ। তবে পরমাত্মার চেতনার প্রকাশ সর্বত্র সমান হয় না।

এই হলো আইডিয়ালিসমের দর্শনের অবস্থা।

ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা খুব বেশিদিন এই দর্শনের ওপর থাকেনি। আইডিয়ালিসম পরিত্যাগ করে বেশ তড়িঘড়ি করে পসিটিভিসমের দর্শন গ্রহণ করে নেয় তারা। আইডিয়ালিসম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। এগুলো বাস্তবতা বিবর্জিত নিরেট তাত্ত্বিকতা।

পসিটিভিসমের প্রবক্তরা প্রথমে চার্চ ও চার্চের ঈশ্বর এবং পরে 'পরম আত্মা'র ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। কিন্তু কোনো সমাধানের দিকে এগুতে পারল না। শেষ পর্যন্ত পসিটিভিস্টরা বস্তুজগৎ, অর্থাৎ প্রকৃতিকে নিজেদের ঈশ্বর বানিয়ে নিল। তাদের মতে, বস্তুজগৎ বা প্রকৃতিই মনকে সৃষ্টি করে এবং মনের ওপর বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তৈরি করে।

কিন্তু এই প্রকৃতি আসলে কী? প্রকৃতি কি সীমিত কোনো সত্তা নাকি মহাজাগতিক কোনো নির্যাস, যা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে? এটি যদি কোনো সত্তা হয়, তবে তার কি সুনির্দিষ্ট কোনো পরিচয় বা সংজ্ঞা আছে? প্রকৃতি মানে কি সমগ্র মহাবিশ্ব? নাকি প্রকৃতি বলতে বিভিন্ন 'বস্তু', তাদের কাঠামো আর গতিকে বোঝানো হচ্ছে? প্রকৃতি বলতে এই দার্শনিকরা এমন কিছুকে বোঝায়, যা অসংজ্ঞায়িত, যার নেই নির্দিষ্ট কোনো আকার বা রূপ।

প্রকৃতির ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যেসব ধারণা আছে, সেগুলোর বাইরে প্রকৃতির কি স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব আছে? নাকি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যতটুকু জানান দেয়, সেটাই প্রকৃতি? নাকি প্রকৃতি এমন কিছু, যা সত্যকে ধারণ করে নিজের মধ্যে?

প্রকৃতি যদি মানুষের স্রষ্টা হয়, তাহলে সে কি মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে শূন্য থেকে 'সৃষ্টি' করেছে? আচ্ছা, প্রকৃতি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা তৈরি করল কিন্তু উদ্ভিদ কিংবা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে করল না কেন? প্রকৃতির কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার, বৈষম্য আর বাছাই করার ক্ষমতা আছে? এ কারণেই কি সে কেবল মানুষকেই যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দিলো?

প্রকৃতির বাস্তবতা যদি শুধু মানবীয় চিন্তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহলে কি একে আসলে স্বাধীন বলা যায়? প্রকৃতি কি তাহলে মানুষের মনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায় না? প্রকৃতি কীভাবে মানুষের মনের 'সৃষ্টিকর্তা' হতে পারে, যখন মানুষের মন ছাড়া অন্য কোথাও তার উপস্থিতি পাওয়া যায় না?

এসব প্রশ্নের উত্তর পসিটিভিস্টরা দিতে পারেনি, উলটো নিয়ে এসেছে হাজারটা নতুন প্রশ্ন।

পসিটিভিস্টরা নিজেরাই স্বীকার করে—'বস্তু' আসলে কী, তারা তা জানে না। তারা মনে করে, -বস্তু চিরস্থায়ী। আর আমরা জানি, বস্তু রূপান্তরিত হয়ে শক্তিতে পরিণত হয়। তাহলে শক্তি যেহেতু বস্তু, আর বস্তু যেহেতু প্রকৃতি, তাহলে শক্তিও কি প্রকৃতি? নাকি- ভর ও কাঠামোসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে? শক্তি আর বস্তুর মধ্যে কে মানুষের মনকে সৃষ্টি করল?

প্রকৃতি নামক এই 'ঈশ্বর' অস্থিতিশীল। তার অবস্থান আর রূপ বদলায় ক্রমাগত। বস্তু আর শক্তির যদি ক্রমাগত রূপান্তর চলতে থাকে; যেখানে কণা শক্তিতে, শক্তি বস্তুতে, বস্তু কণাতে পরিণত হবার চক্র চলে, তাহলে কোন পর্যায়ে জীবন আর মনের (consciousness) উৎপত্তি হলো? এই 'ঈশ্বর' সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করল কখন? কোন অবস্থায়?

পসিটিভিস্টরা বলে প্রকৃতি মানুষের মনে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। প্রশ্ন হলো, শুধু মানুষের মনে কেন? প্রকৃতি কেন অন্য সব জীবিত প্রাণের সাথে কথা বলে না? প্রকৃতি কি গরু, গাধা, খচ্চর, টিয়া পাখি কিংবা বানরের মনেও বাস্তবতার ছাপ তৈরি করে? যদি করে, তাহলে বানর, খচ্চর কিংবা শামুকের মনে তৈরি হওয়া বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি আর অগুস্ত কন্ট কিংবা মার্ক্সের মনে তৈরি হওয়া প্রতিচ্ছবি কি একই? নাকি আলাদা?

আরও প্রশ্ন থাকে। প্রকৃতি কি মানুষের মনে বাস্তবতার সঠিক প্রতিচ্ছবিই তৈরি করে? মানুষের মনই না একসময় বলত—পৃথিবী হলো মহাবিশ্বের কেন্দ্র? তারপর আবার মানুষের মনই একসময় বলা শুরু করল, পৃথিবী শুধু ছোট্ট একটা গ্রহ, যা সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানুষ তো এগুলো বলেছে নানা বাস্তবতার আলোকেই, তাই না? মানুষের মনে প্রকৃতির তৈরি এই প্রতিচ্ছবিই না একসময় বলেছিল—সব বস্তু ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি আর মনের তৈরি? আবার আরেক সময় বলেছিল, মন হলো বস্তুর তৈরি?

কোনটা সঠিক? কোন প্রতিচ্ছবি সঠিক? এই পরস্পরবিরোধী অবস্থানগুলোর মধ্যে কোনটা বাস্তবতার সেই প্রতিচ্ছবি, যা প্রকৃতি মানুষের মনে তৈরি করে? এই পরস্পর বিরোধিতার ব্যাখ্যা কী? প্রকৃতি কি ভুল করছে? নাকি মানুষের মন ভুল করছে? ভুলটা যদি মনের হয়, তাহলে মানুষের মন কি স্বাধীন ও সক্রিয় কর্তা হিসেবে প্রমাণিত হয় না? তাহলে পসিটিভিস্টরা কেন বলে, মন পুরোপুরিভাবে প্রকৃতির অধীনস্থ?

জীবনের উৎস এবং রহস্য নিয়ে পরের একটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। সেখানে এ বিষয়ে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এবং অন্যান্য ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অবস্থানও আমরা দেখব। এখানে আমরা কেবল একটা প্রশ্ন তুলব,

বস্তুবাদী দার্শনিকরা যে ঈশ্বরের কথা বলে, সেটা আসলে কী? সেটা আসলে কে?

অভিজ্ঞতা ও চিন্তার জায়গা থেকে তাদের এসব ব্যাখ্যায় শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার মতো স্পষ্ট ও মজবুত কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তাহলে মানুষ কেন বিচিত্র এই 'মূর্তি'কে গ্রহণ করবে, যাকে ধরা যায় না, ছোয়া যায় না, আর বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও যা নড়বড়ে?

আলহামদুলিল্লাহ, চার্চের বিকৃতি থেকে মুসলিমদের পালানোর প্রয়োজন নেই। মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের সংকীর্ণ চিন্তা মানুষের জীবন, কর্ম আর অনুপ্রেরণাকে অর্থনীতির ভেতরে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। মানুষের বিস্তৃত অস্তিত্ব ও জীবনকে তারা সীমাবদ্ধ করে 'উৎপাদনের উপাদান' নামক ইঁদুরের গর্তে। বস্তুজগতের বিশালত্ব নিয়ে চিন্তা করলে এই ধরনের ব্যাখ্যা তীব্র বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। একবার ভেবে দেখুন, কত শত শক্তি আর চলকের অবিশ্বাস্য সমন্বয় আর ভারসাম্যের ফলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের উপযোগী শর্ত এবং পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চিন্তা করুন, সমগ্র সৃষ্টিজগতে মানুষকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ অবস্থান দেওয়া হয়েছে। এবার মার্ক্স আর এঙ্গেলসের দিকে তাকান। এই বিশাল বিস্তৃতি, এই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা নিজেদেরকে অর্থনীতি আর 'উৎপাদনের উপাদান'-এর সংকীর্ণ ঘরে বন্দিবন্দী করে নিয়েছে। এগুলোকে তারা শুধু মানুষের সব কাজের উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণাই মনে করে না, বরং তারা মনে করে এগুলোই হলো মানব সভ্যতার আদিকারণ, মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণকারী রব। তাদের চিন্তা এবং মনোভাবের ক্ষুদ্রতা আর সীমাবদ্ধতা দেখে কেবল বিতৃষ্ণাই তৈরি হয়।

আমরা আবারও বলছি, ইউরোপে চিন্তাগত এই বিপর্যয় নেমে এসেছিল ক্যাথলিক চার্চ ও যাজকতন্ত্র আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওহির অবস্থান থেকে সরে যাবার কারণে। ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা বাধ্য হয়েছিল চার্চ এবং চার্চের ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ থেকে পালাতে। আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে তিনি বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তিত রেখেছেন। কোনো 'চার্চকে' এর তত্ত্বাবধায়ক বানাননি, সুযোগ দেননি এই 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-কে দূষিত করার। যে ধরনের আদর্শিক দ্বন্দ্বের ফলে ইউরোপে এত সব অনুমাননির্ভর, অসংলগ্ন বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার জন্ম, তেমন কোনোকিছু কখনো ইসলামি সভ্যতায় ছিল না। কারণ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। ইসলাম মানবীয় বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বিশাল একটি ক্ষেত্র ছেড়ে দেয়। গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। বরং ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে এতে অনুপ্রাণিত করে। ইসলাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধী নয়, বরং মহান আল্লাহর খলীফা হিসেবে বিজ্ঞান

পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনীয় ভূমিকাগুলোর অন্যতম।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মহান নিয়ামাত। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের মানবীয় অনুমান, ধ্যানধারণা আর খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে হেফাযত করেছেন। আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা তাঁরই।

---

[1] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন—মুহাম্মাদ কুতুব রচিত, 'মানহাজুত তারবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ' (مَنْهَجُ التَّرْبِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ)।

[2] ড. অ্যালেক্সিস কারেল (মৃত্যু. ১৯৪৪) ছিলেন একজন ফরাসি-অ্যামেরিকান সার্জন ও বায়োলজিস্ট। ১৯১২ সালে তাঁকে শরীরতত্ত্ববিদ্যা/চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর রচিত সাড়া জাগানো বই Man, the Unknown প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। (অনুবাদক)

[3] অ্যালেক্সিস কারেল (১৯৩৫), Man the Unknown, পৃষ্ঠা ৪-৫।

[4] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫-৬।

[5] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮-১০।

[6] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নাদভি, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? (১৯৫০), পৃষ্ঠা ১১৪, মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

[7] আইডিয়ালিসম (ভাববাদ) : আইডিয়ালিসম বলতে মূলত জার্মান ভাববাদ বা ইউরোপীয় ভাববাদকে বোঝানো হচ্ছে। ইউরোপীয় ভাববাদ একটি দার্শনিক ধারা, যার উৎপত্তি ইউরোপে; প্রাথমিকভাবে জার্মানীতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। ইউরোপীয় ভাববাদের অবস্থান হলো—চূড়ান্ত বা পরম বাস্তবতার প্রকৃতি মূলত মানসিক বা আধ্যাত্মিক। বস্তুগত জগৎ এই অন্তর্নিহিত বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি কেবল। এই দর্শনে ইমানুয়েল কান্ট এবং জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিখ হেগেলের চিন্তার প্রভাব ব্যাপক। এটি পরবর্তীতে অস্তিত্ববাদ (existentialism), মার্ক্সবাদ এবং ক্রিটিক্যাল থিওরির বিকাশ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পসিটিভিসম (দৃষ্টবাদ) : পসিটিভিসম বা দৃষ্টবাদ একটি দার্শনিক তত্ত্ব, যা বলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই একমাত্র প্রামাণিক বা বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে শুধু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তত্ত্বের নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। দৃষ্টবাদকে ফরাসি চিন্তাবিদ অগুস্ত কন্ট (Auguste Comte)-এর সাথে যুক্ত করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে দৃষ্টবাদ ইউরোপে একটি প্রভাবশালী চিন্তাধারা হিসেবে

বিকাশ লাভ করে।

ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিসম (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ) : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন মার্ক্সবাদ এবং কমিউনিসমের সাথে জড়িত। মার্ক্সবাদের দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার সামগ্রিক রূপই হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এটি মূলত বস্তুবাদের একটি সংস্করণ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অবস্থান হলো—বস্তুই মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতি ও তার ঘটনাগুলোর মূল ভিত্তি হলো বস্তু। মন, চেতনা, মানবসমাজ—সবকিছুই বস্তুগত অবস্থার সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

দ্বান্দ্বিকতা (dialectic) বলতে দুটি পরস্পরবিরোধী সংঘাতজনিত প্রক্রিয়া বোঝানো হয়। সাধারণত একে ব্যাখ্যা করা হয় তিন ধাপের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে : তত্ত্ব (thesis), প্রতিতত্ত্ব (anti-thesis) ও সমন্বয় (synthesis)। তত্ত্ব হলো কোনো ধারণা। প্রতিতত্ত্ব হলো তত্ত্বের বিপরীত বা প্রত্যাখ্যান। সমন্বয় হলো তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্বের দ্বন্দ্বের সমাধান, যা নিজের মধ্যে দুটোকেই ধারণ করে। প্রতিটি সমন্বয় তত্ত্বে পরিণত হয়ে নতুন প্রতিতত্ত্বের জন্ম দেয়, যা থেকে আবার সমন্বয় তৈরি হয়। এভাবে প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

দার্শনিক হেগেলের উপস্থাপিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ধারণাকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাদের মতে, এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকা শক্তি সমাজের বস্তুগত অবস্থা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বই সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের প্রধান উৎস। পৃথিবীর ইতিহাস মূলত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানবসমাজ বিকশিত হয়। পুঁজিবাদী -ব্যবস্থায় এই দ্বান্দ্বিকতা বা সংগ্রামের প্রকাশ ঘটে শাসকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির মাঝে। এ নিয়ে পরের অধ্যায়গুলোতে আরও আলোচনা আনা হয়েছে। (অনুবাদক)

[8] মুহাম্মাদ আল-বাহি (মৃ. ১৯৮২) : ড. মুহাম্মাদ আল-বাহি ছিলেন একজন মিশরীয় চিন্তাবিদ এবং মিশরের সাবেক আওকাফ মন্ত্রী। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উসূলুদ্দীন এবং আরবি ভাষা অনুষদে শিক্ষতা করেছেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া আল-বাহি ক্যানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিটিং প্রফেসর ছিলেন। ড. আল-বাহি'র সবচেয়ে বিখ্যাত বই, Modern Islamic thought and its connection with Western colonialism (اَلْفِكْـــــرُ الْإِسْـلَامِيُّ الْحَدِيْـثُ وَصِـلَتُهُ بِالْاِسْـتِعْمَارِ الْغَرْبِـيِّ)। বইটির বিভিন্ন উদ্ধৃতি সাইয়্যিদ কুতুব বক্ষ্যমাণ বইতে ব্যবহার করেছেন। (অনুবাদক)

[9] ট্রিনিটি (Trinity) : ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদ খ্রিষ্টধর্মের কেন্দ্রীয় একটি বিশ্বাস। ত্রিত্ববাদ অর্থ 'এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—এই তিন ব্যক্তির মিলন'। তবে 'তারা তিন ঈশ্বর নয়, তারা এক ঈশ্বর'। এখানে পিতা দ্বারা আল্লাহ, পুত্র দ্বারা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিকভাবে খ্রিষ্টানদের অনেকে পবিত্র আত্মার বদলে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-কেও ট্রিনিটির অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে এধরনের জঘন্য মিথ্যাচার থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ বলেছেন,

> তারা অবশ্যই কুফরি করেছে, যারা বলে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়', অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ

নেই।' (সূরা মায়িদা, ৫ : 73)

কনফেশন (confession) : কনফেশন বা পাপস্বীকার ক্যাথলিক মত অনুযায়ী খ্রিষ্টধর্মের সাতটি সংস্কারের (সাক্রামেন্ট/sacrament) অন্যতম। পাপস্বীকার বলতে যাজকের কাছে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি করাকে বোঝানো হয়। স্বীকারোক্তির পর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে; অর্থাৎ ট্রিনিটির নামে, অনুতপ্ত ব্যক্তির গুনাহ যাজক ক্ষমা করে দেন। সহজ ভাষায় গুনাহগার ব্যক্তি গির্জার যাজকের কাছে গিয়ে তাওবা করবে আর যাজক তাকে মাফ করে দেবে। ব্যক্তির তাওবা করতে হবে ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমে। ক্যাথলিক চার্চের পাশাপাশি অর্থোডক্স চার্চেও পাপস্বীকারের অনুশীলন আছে। মার্টিন লুথার ও তার অনুসারী প্রটেস্ট্যান্টদের অধিকাংশ পাপস্বীকারের এই রীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের মতে তাওবা করতে হবে যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে, চার্চ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নয়।

ইসলামের অবস্থান হলো—গুনাহ স্বীকার ও ক্ষমার বিষয়টি বান্দা ও তার রবের মধ্যে। মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টিকে পাপমোচনের ক্ষমতা দেননি। তাওবা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, শুধুই তাঁর কাছে সরাসরি। কোনো+ সৃষ্টির কাছে নয়। এছাড়া খাটি তাওবার কিছু শর্ত আছে।÷ যেমন :

গুনাহর জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে; যে গুনাহ থেকে তাওবা করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে; ভবিষ্যতে এই গুনাহ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে; নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাওবা করতে হবে (অর্থাৎ মৃত্যু অথবা কিয়ামাতের সময় উপস্থিত হবার আগে); যদি কোনো গুনাহর ফলে মানুষের হক নষ্ট হয়, তাহলে যার হক নষ্ট হয়েছে, তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা ক্ষমা চেয়ে তার সাথে মিটমাট করে নিতে হবে।

ইনডালজেন্স (Indulegence) : ইনডালজেন্স বা নিষ্কৃতিপত্র হলো—ক্যাথলিক চার্চের পোপের ইস্যু করা ছাড়পত্র, যা আখিরাতে আংশিক বা সম্পূর্ণ পাপমুক্তির আশ্বাস দেয়। অর্থাৎ কারও কাছে ক্যাথলিক চার্চের অনুমোদিত নিষ্কৃতিপত্র থাকলে আখিরাতে সে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়ে যাবে, দুনিয়াতে সে যা-ই করুক না কেন। এই নিষ্কৃতিপত্র অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হতো। একাদশ শতাব্দীতে এ প্রথা চালু করা হয় সাধারণ খ্রিষ্টানদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেইডে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য। পরে তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে এটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। যেমন রোমের সেইন্ট পিটারের বাসিলিকা পুনর্নির্মাণের অর্থায়নের জন্য নিষ্কৃতিপত্র বিক্রি করা হয়। এই নিষ্কৃতিপত্রগুলো বিক্রি হতো গির্জার কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমান বিক্রেতাদের মাধ্যমে।

১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পোপ চতুর্থ সিক্সটাস ঘোষণা করে, জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি উভয়ই নিষ্কৃতিপত্রের সুবিধা পাবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নামে নিষ্কৃতিপত্র কেনা হলে তার আখিরাতের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হবে। ফলে অনেকেই নিজ পরিবারকে অসহায় রেখে ঘরবাড়ি বিক্রি করে নিষ্কৃতিপত্র কিনতে শুরু করে। যাজকদের অনেকেই পাপ থেকে বিরত থাকার কথা না বলে, উলটো টাকা দিয়ে কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করত। অনেকেই একে পাপের লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। চার্চের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে তৈরি হলো ক্ষোভ। মার্টিন লুথারের মতে, নিষ্কৃতিপত্র খ্রিষ্টীয় শিক্ষার বিকৃতি। প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশানের পেছনে একটি বড় কারণ ছিল—ইনডালজেন্স বা নিষ্কৃতিপত্র নিয়ে বিতর্ক। (অনুবাদক)

[10] Deism : ডীইসম (Deism) শব্দের যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অনেকে অনুবাদ করেন 'যৌক্তিক একেশ্বরবাদ'। সেটাও ঠিক মানানসই নয়। সহজ ভাষায় Deism হলো ধর্মকে বাদ দিয়ে স্রষ্টায় বিশ্বাস। Deist-রা মনে করে মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। সৃষ্টিজগতের আইন, প্রকৃতির নির্মাতা। কিন্তু তিনি উদাস নির্মাতা। প্রবাসী বাড়িওয়ালার মতো। সব ঠিকঠাক করে দম দেওয়া ঘড়ির মতো মহাবিশ্বকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে সৃষ্টিজগতে তিনি আর হস্তক্ষেপ করেন না। কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করে তাকে পাওয়া যাবে না। তাকে পাওয়ার উপায় হলো—যুক্তি, বিজ্ঞান আর অনুসন্ধান। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনা। তাই ধর্ম দিয়ে কাজ চলবে না। রাষ্ট্র, সমাজ, শাসন চালাতে হবে মানুষের বানানো বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদ (এনলাইটেনমেন্টের দর্শন) দিয়ে। (অনুবাদক)

[11] পসিটিভিসমের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী প্রচারক, অগুস্ত কন্ট 'পরম মানবতার ধর্ম' নামে এক সেক্যুলার ধর্মের প্রবর্তন করেছিল। কন্টের মতে, মানবসমাজ উন্নয়নের নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী অগ্রসর হয়। আর অগ্রগতির পথ পরিক্রমায় মানবতা একসময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে, যখন প্রচলিত ধর্মগুলো 'পরম মানবতার ধর্ম' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। পরম মানবতার ধর্মের ভিত্তি তৈরি হবে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের ওপর, অর্থাৎ পসিটিভিসমের ভিত্তির ওপর। এ ধর্মে উপাস্য হলো মানবতা, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হবে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো, আর মানবজীবনের লক্ষ্য সামাজিক প্রগতি। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারের বদলে কন্ট ১৩ মাসের নতুন ক্যালেন্ডার প্রণয়নের চেষ্টা করেন। স্রষ্টার বদলে মানবতার প্রশংসার জন্য বলেন স্তুতিসংগীত রচনার কথাও। ফ্রান্স ও ব্রাজিলে এ ধর্মের উপাসনালয় আছে। কন্টের পরম মানবতার ধর্ম মূলত একধরনের সেক্যুলার বিশ্বাস (faith) নির্মাণের প্রচেষ্টা। সেক্যুলার ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রবণতা কন্টের আগে এবং পরেও দেখা গেছে। এর মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের সময়কার Cult of Reason (পরম বুদ্ধিমত্তার ধর্ম) এবং Cult of the Supreme Being (পরম সত্তার ধর্ম) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কন্টের মানবতার ধর্ম নিয়ে আরও জানার জন্য দেখতে পারেন :

Wernick, Andrew. Auguste Comte and the religion of humanity: the post-theistic program of French social theory. Cambridge University Press, 2001. (অনুবাদক)

[12] মার্ক্স (মৃ. ১৮৮৩) : কার্ল মার্ক্স বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। —সমাজ, অর্থনীতি, ও রাজনীতিসংক্রান্ত মার্ক্সের তত্ত্বসমূহ মার্ক্সবাদ নামে পরিচিত। মার্ক্সকে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের অন্যতম মনে করা হয়। (অনুবাদক)

[13] অগুস্ত কন্ট (August Comte, মৃ. ১৮৫৭) : অগুস্ত কন্ট উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক। তাকে

সমাজবিজ্ঞানের (sociology) জনক গণ্য করা হয়। তিনি পসিটিভিসম বা দৃষ্টবাদের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন। (অনুবাদক)

[14] মুহাম্মাদ আল-বাহি, Modern Islamic thought and its connection with Western colonialism (اَلْفِكْـرُ الْإِسْلَامِيُّ الْحَدِيْثُ وَصِلَتُهُ بِالْاِسْتِعْمَارِ الْغَرْبِيِّ)।

[15] ফিকটে : ইয়োহান গটলিব ফিকটে (মৃ. ১৮১৪) একজন জার্মান দার্শনিক। তাকে জার্মান ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মনে করা হয়। (অনুবাদক)

[16] হেগেলের মতে, মহাবিশ্ব ঈশ্বরের আত্মজ্ঞানের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাস হলো ঈশ্বরের আত্ম-উপলব্ধির গল্প। ঈশ্বরের সত্যিকারের প্রকৃতি জানার জন্য প্রচলিত ধর্মগুলো যথেষ্ট নয়। তাই নতুন 'আত্মার ধর্ম' দরকার। ঈশ্বরের ব্যাপারে হেগেলের ধারণা ইতিপূর্বে আলোচিত ডায়ালেকটিকের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। (অনুবাদক)

[17] হেগেল : গেয়র্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) জার্মান ভাববাদ বা জার্মান আইডিয়ালিসমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক। 'ডায়ালেকটিক' এবং মানবীয় চেতনার বিবর্তন তাঁর উল্লেখযোগ্য ধারণাসমূহের অন্যতম। জার্মান ভাববাদ ছাড়াও হেগেলের দর্শন কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিডরিখ নিৎচার মতো দার্শনিকদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। (অনুবাদক)